



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 856 - 863

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলার একটি কৃষিভিত্তিক মেয়েলি ব্রত : ভাঁজো

নীহার ঘোষ

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: nrghosh.097@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

কৃষিভিত্তিক ব্রত,
ভাঁজো গান,
মেয়েলি ব্রত।

Abstract

বাংলার একটি কৃষিভিত্তিক ব্রতানুষ্ঠান হল ভাঁজো। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার কৃষিজীবী গ্রামগুলিতে এই ব্রতের প্রচলন রয়েছে। ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত এই ব্রত হল মূলত বীজের উৎপাদন শক্তি যাচাই এবং ভালো ফসলের কামনায় মেয়েলি ব্রত। দশদিন ধরে চলা এই ব্রতে মাটির পাশে শস্য পুঁতে তাকে অঙ্কুরিত করা হয় এবং তার পর সদ্য চারাগাছকে গর্ভবতী নারী কল্পনা করে পূজো করা হয়। প্রতিদিনের পূজো উপলক্ষে মেয়েরা নানা ধরনের ছড়া বা গান গেয়ে থাকে, এগুলিকে ভাঁজোগান বলা হয়। এই গানগুলিতে বাংলার গ্রামীণ পরিবার ও সমাজের সুখ দুঃখ, প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে। ব্রতের শেষদিন রাতে নাচগানের মধ্য দিয়ে ভাঁজো বিসর্জন করা হয়। মূলত কুমারী অববাহিত নারীদের এই ব্রতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, বিসর্জনের দিন ঢাক বাজানোর জন্য পুরুষ সদস্যদের প্রয়োজন হয়, এছাড়া এই ব্রতে পুরুষদের কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। বাংলার কৃষিসমাজের জীবন, উৎসব ও বিশ্বাসের ত্রিধারা মিলিত হয়েছে এই ব্রতের মাধ্যমে।

Discussion

পশ্চিম বাংলা মূলত কৃষিপ্রধান এবং বাঙালি উৎসবমুখর, একই সঙ্গে ধর্মপ্রাণ ও বটে। তাই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিটি কাজ যেমন জমি চাষ করা, বীজবপন, ফসল পরিচর্যা, ফসল কাটা, মাড়াই করে গোলাজাত করা - সমস্ত কাজ আনন্দ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করতে উদগ্রীব থেকেছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আদিম সংস্কার। তাই ভালো ফসলের আশায় যেমন সে ক্ষেত্রদেবতা, ডাকসংক্রান্তির পূজো করে, তেমনি ফসল কেটে তোলার পর আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে একই সঙ্গে সারা বছরের জন্য স্বচ্ছল জীবনের প্রার্থনা জানিয়ে ভাদু, নবান্ন, আউনি-বাউনি, টুসু, তুসু-তুসালির মতো ব্রত করে। আবার বীজ বপনের আগে সেই বীজের উৎপাদিকাশক্তি যাচাই করার জন্য বীজকে অঙ্কুরিত করার কিছু ব্রতও পালন করে। হুঁতুপূজো, জাওয়া পরবের মতো এই ধরনের বাংলার আরো একটি ব্রত হল ভাঁজোব্রত। এই ধরনের ব্রতগুলিতে গ্রামীণ মানুষের কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এই ব্রতগুলিতে তাদের জীবনের মূল অবলম্বন কৃষি, উৎসবপ্রাণতা ও বিশ্বাসের এক সুন্দর মেলবন্ধন ঘটে। বাংলার এই কৃষিভিত্তিক ব্রতগুলির অধিকাংশই মেয়েলি ব্রত। কোনো কোনো জায়গায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অনুপ্রবেশ ঘটলেও এই ব্রতগুলির ভাবনা,

আয়োজন, পূজা পদ্ধতিতে একান্তই অন্তঃপুরের একচ্ছত্র আধিপত্য। আলপনা দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে মেয়েরা সমবেতভাবে নাচগান করে আনন্দে মেতে ওঠে। তাদের আরাধ্য দেবদেবীকে নিয়ে নিজেদের মতো ছড়া কাটে, গান তৈরি করে, যেখানে তাদের পূজিতা দেবী হয়ে ওঠে পরিবারের পরম আদরের মেয়ে।

বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের উপকরণ হিসাবে এই ব্রতগুলির মূল্য অপরিসীম। একান্ত লোকায়তিক এই ব্রতগুলির মধ্যে দিয়েই যেন দুর্যোধ্য বৈদিক মন্ত্র, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সহজে ধরা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থে লিখেছেন –

“খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আৰ্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ-দু’-এরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দু’-এর মধ্যে এইজন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে।”^১

আর্যদের ধর্মভাবনায় যজ্ঞ আর অনার্য ব্রাত্যজনের জন্য ব্রত, কিংবা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরুষ প্রাধান্য আর ব্রত মেয়েলি ভাবনা – এই ভাবে যে তফাৎ করা হয় তার ও সহজ সমাধান দিয়েছেন তিনি –

“আর্য এবং আর্যপূর্ব দু’জনেরই সম্পর্ক যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দু’জনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন, ধান, সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস; দু’জনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন— ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক, ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—‘রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতি হব।’”^২

ব্রতের তাৎপর্য নিয়ে আরো আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন –

“একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এককাজ এক উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল —একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। ... ব্রত ও উপাসনা দুই-ই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাত।”^৩

এই ব্রতগুলিকে প্রাচীন সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে সমাজের ইতিহাস আমাদের সামনে উঠে আসবে তা হল আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের এক লোকইতিহাস, যে সমাজে গোষ্ঠীভাবনাটিই মূলসূত্র, পৃথিবীর যেসকল সমাজে এখনও আদিম গোষ্ঠীজীবনের সংস্কার ক্ষীণ হলেও বজায় থেকেছে, সেই সমাজের ব্রত, বিশ্বাসগুলির বিশ্লেষণ সমাজ ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাপথটি চিনতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, –

“আদিম সমাজে একের কোনো সভা নেই, একার পরিচয়টা নেহাতই ক্ষীণ। তারা দশে মিলে একসঙ্গে এক হয়ে যখন কিছু করে তখনই কাজটি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যায় আদিম সমাজ জীবনে যাদুবিশ্বাসের উপযোগিতাটুকুও। “ব্রতের প্রাণ-বস্তু হল যাদুবিশ্বাস— মানুষ যা কামনা করে ব্রত করছে ব্রতের মধ্যে সেই কাজটিই সফল হবার একটা নকল করা হচ্ছে, এবং নকল যে করা হচ্ছে তা প্রধানত এই বিশ্বাস থেকেই যে, মানুষ যা করবে প্রকৃতিতে বাস্তবিকই তাই ঘটবে। “ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা” — মেয়েরা এই গান করছে মনের আনন্দকে প্রকাশ করবার তাগিদে নয়, তাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ওই ভাবেই ভাঁজো সতিই কলকলিয়ে উঠবে, ফলবে প্রচুর শস্য। ...কামনাই নয়, কামনা সফল হওয়ার বিশ্বাসও। সেই বিশ্বাস হল যাদুবিশ্বাস। প্রাচীন সমাজে তাই

নাচগান অবসর-বিনোদন নয়, সৌন্দর্য উপভোগ নয়, এগুলির উৎসে রয়েছে যাদুবিশ্বাস। এবং এই যাদুবিশ্বাসকে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ সংস্কার মনে করাও ভুল হবে। কেননা, যতোদিন পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন-কৌশল অনুন্নত ততোদিন কাজের জন্যেই যাদুবিশ্বাসের অতো প্রয়োজন। এই কারণেই আদিম যুগে গান আর অন্ন-আহরণ সত্যিই আলাদা হয় নি।”^৪

প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির অংশবিশেষ লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলি একত্রিত করে ইতিহাসের উপাদান রূপে ব্যবহার করার কাজ খুব একটা সহজ হয় না। কারণ ইতিহাসে ব্যবহৃত তথ্য উপাদানগুলি স্থির (Static), কিন্তু লোকসংস্কৃতির উপকরণগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল প্রবাহমানতা। লোকসংস্কৃতির বর্তমান রূপ দেখে কোনো একসময়ের তার নির্দিষ্ট অতীতটা সম্পূর্ণ ভাবে জানা ইতিহাসবিদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। লোকসংস্কৃতির বিষয় মাত্রই তার প্রাচীন ঐতিহ্য থাকলেও, নতুন যুগে উদ্ভীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উপকরণ সংগ্রহ করে তা নিজের প্রাণধারা বজায় রাখে। ইতিহাসের তথ্য সেই ঐতিহ্যের মর্মমূলে নিহিত থাকে। লোকসংস্কৃতি বিশেষ করে এইসব ব্রত, লৌকিক প্রথা, লৌকিকগান, ছড়া, নাটক এগুলি সাধারণ ভাবে লিখিত আকারে থাকে না, সময়ের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে সেগুলি সংযোজন, পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই কারণে মধ্যযুগে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিকে যেভাবে সমকালীন সমাজ জীবনের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহার করা যায়, লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সেভাবে ব্যবহার করা যায় না। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন-

“The facts of history, are not supposed to be change once they are established - the facts of folklore change every time a different person retells a story or sings a ballad, because folklore is a living organisms that is transmitted by tradition and dies when it become static.”^৫

ব্রতের পাশাপাশি এই ছড়া বা গানগুলি বাংলার লোকসঙ্গীতের ভান্ডারকেও সমৃদ্ধ করে। যে লোকসঙ্গীতের মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে পরিবার ও সমাজ জীবনের সুখ দুঃখের টুকরো টুকরো চিত্রগুলি। ভাঁজো উৎসবের গানগুলি যেহেতু লোকসঙ্গীত হিসাবেও গ্রহণ করা যায় সেই কারণে ভাঁজো উৎসবের কথা আলোচনার আগে লোকসঙ্গীত নিয়ে দু-চারটি কথা বলা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। জাতির ধ্যান ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলির সার্থকতম প্রকাশ ঘটে লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত থাকে নানান প্রথা-সংস্কার, জীবন সংক্রান্ত সমস্যার নানা দিক। এককথায় সমাজ বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হয়ে থাকে লোকসঙ্গীতগুলি। লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন - প্রথমত, এগুলি মৌখিকভাবে রচিত হয় এবং মৌখিকভাবেই সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করে রক্ষিত হয় ও প্রচার লাভ করে। লোকসঙ্গীতগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার সংস্কার কোনো সমাজেই সেভাবে গড়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, লোকসঙ্গীতে সুর ও তাল শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রণালী থাকে না, শিল্পীরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী এগুলি আয়ত্ত্ব করে থাকে। এই কারণে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের মতো লোকসঙ্গীতের পক্ষে নিজস্ব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, প্রবাহমানতা হল লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। নতুন নতুন যুগে উদ্ভীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসঙ্গীত তার নিজস্ব উপকরণ খুঁজে নেয়। চতুর্থত, লোকসঙ্গীতের অন্যতম বিশেষত্ব হল আঞ্চলিকতা, গান হিসাবে সেগুলির মধ্যে স্থানীয় আবেদন থাকলেও এক একটি অঞ্চলের জীবনকে আশ্রয় করে লোকসঙ্গীতগুলি বিকাশ লাভ করে। আঞ্চলিক প্রকৃতি, জীবন জীবিকার বাস্তবতা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি আঞ্চলিক ভাষা ও সুরের ব্যবহার বহুল লক্ষণীয়। পঞ্চমত, শুধুমাত্র আঞ্চলিক বিশেষত্ব নয়, লোকসঙ্গীতে অনেক সময় ক্ষুদ্র নরনারীর গোষ্ঠী বিভাগও দেখা যায়। অর্থাৎ মেয়েলি ব্রতকথায় যে ধরনের গান হয় সেখানে পুরুষরা অংশগ্রহণ করে না, আবার এমন কিছু লোকসঙ্গীত রয়েছে সেগুলিকে মূলত পুরুষকেন্দ্রিক বলা যায়।^৬

গানের প্রকৃতি ও বিষয় অনুসারে লোকসঙ্গীতগুলিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় - ১) ব্যবহারিক সঙ্গীত (Functional Song) : এগুলি ব্যবহারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থাকে যার বাইরে এর ব্যবহার ঘটে না, যেমন বিয়ের গান। ২) আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত (Ritual Song) : বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট উপলক্ষে এই গানগুলি হয়, যেমন গাজনের গান, ভাঁজো উৎসবের গান। ৩) কর্মসঙ্গীত (Work Song) : নৌকা বাইচের গান, ধান কাটার গান, ছাদ পেটানোর গান। ৪) ধর্মীয়

সঙ্গীত : বাউল, মুর্শিদা, মারফতী প্রভৃতি গান, যেগুলিতে নির্দিষ্ট ধর্মদর্শনের কথা থাকলেও জীবন চেতনা থেকে উৎসারিত হওয়ায় লোকসঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। ৫) প্রেমমূলক সঙ্গীত : রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান থেকে শুরু করে সাধারণ নরনারীর দেহজ কামনা বাসনা কেন্দ্রিক গানগুলি এই পর্যায়ে পরে। ৬) আবেগপ্রকাশক বা প্রবৃত্তিজাত গান : হাপু গান, সঙের গান প্রভৃতি।^৭

ভাঁজো উৎসব : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার লোকউৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত ভাঁজো পুজো। বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ভাঁজো উৎসবের এখনও যথেষ্ট চল রয়েছে। এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশেও ভাঁজো উৎসব প্রচলিত আছে। ভাঁজো দেবীর পুজো উপলক্ষ্যে ছড়ার আকারে যে গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে সেগুলিই ভাঁজো গান নামে পরিচিত। পুজো উপলক্ষ্যে গাওয়া হলেও এইসব গানগুলিতে লৌকিক সামাজিক জীবনের নানা প্রসঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ভাদ্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয় বাংলার আরো একটি লোকব্রত ‘ভাদুলি’, অনেকেই এই দুই ব্রতকে অভিন্ন ভেবে ভুল করেন। ভাদুলি হল প্রবাসে থাকা পরিবার পরিজনদের মঙ্গল কামনা করে পালিত ব্রত। নদীর ধারে অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা আলপনা দিয়ে ছড়া কেটে পালন করে সেই ব্রত। ভাঁজোর মতোই সেখানে উপজীব্য ‘ভাদুলিরাণি’, তাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয় মেয়েলি ছড়াগুলো। বাংলার বণিকরা যখন ডিঙা সাজিয়ে নৌবাণিজ্য করতে যেতেন, বর্ষা শেষে তাদের নিরাপদে ঘরে ফেরার কামনা থেকেই এই ব্রতের উৎপত্তি হয়েছিল।

ভাঁজো নামটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সাধারণ মতটি হল ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় বলেই পুজোর নাম ভাঁজো। (ভাদ্র>ভাজ্জ>ভাজো>ভাঁজো)। আবার অপর একটি মত হল ভাদ্র মাসে একটি বিশেষ ধরনের ধান মাঠ থেকে ওঠে, যাকে ‘ভাদই’ বলা হয়। এই ভাদই কথাটি থেকে ভাঁজই বা ভাঁজো কথাটি এসেছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ভাঁজো উৎসব ফসল তোলার উৎসব নয়, বরং ভালো শস্য উৎপাদনের কামনায় এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। অনেকে ভাঁজো শব্দটির উৎপত্তি খোঁজেন সংস্কৃত শব্দ ‘ভাজ’ এর মধ্যে, যার অর্থ দীপ্তি বা শোভা।^৮ ভাঁজো উৎসবে দেবীরূপে একটি মাটির তৈরী নারী মূর্তি পুজো করা হয়, নৃত্যরতা রমণীর কোমরের ‘ভাঁজ’ থেকেও ভাঁজো নামটি এসে থাকতে পারে। আবার চাল, ছোলা ইত্যাদি শস্য ভাজবার মাটির পাত্রকেও ‘ভাজ’ বলে। গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভধারণের সপ্তম মাসে যে অঙ্ক ব্যঞ্জন দেওয়া হয় তাকেও ‘ভাজ’ বলে।^৯ লক্ষ্যণীয় হল যে ভাঁজো ব্রততেও বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারাগাছে পরিনত হলে তাকে গর্ভবতী কল্পনা করে সাধভক্ষণ করানো হয়।

ভাঁজো পুজোর প্রচলন সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যার সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়- কুমারী মেয়েরা ভোলানাথ শিবের পুজো করে, দেবরাজ ইন্দ্রের ও কুমারী মেয়েদের পুজো পাবার ইচ্ছা জাগে। এই কারণে তিনি স্বর্গের এক অঙ্গরা ভজ্জাবতীকে অভিষেক দিয়ে মর্ত্যে পাঠান। ভজ্জাবতী কুমারী মেয়েদের মধ্যে ইন্দ্রের পুজো প্রচলন করেন। এই ভজ্জাবতীই হলেন ভাঁজো। অর্থাৎ ভাঁজো একান্ত ভাবেই লৌকিক দেবী। সাধারণভাবে কুমারী মেয়েদের পুজো হলেও বিবাহিত গৃহিণী বা বয়স্ক মহিলারা ভাঁজো পুজোয় যুক্ত থাকেন।

ভাঁজোর ব্রত : ভাদ্র মাসের শুরু পক্ষের দ্বাদশী বা ইন্দ্রদ্বাদশী থেকে জিতাষ্টমী পর্যন্ত দশদিন ধরে ভাঁজো উৎসব পালিত হয়। ভাঁজো পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রাঢ় অঞ্চলের অপর একটি লৌকিক উৎসব ইঁদ পুজো, যেটি ইন্দ্র দ্বাদশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজো আসলে দেবরাজ ইন্দ্রের পুজো। তাঁর প্রতীক হিসেবে ইন্দ্রধ্বজ বা একটি ছাতাকে পুজো করা হয়। পুজোর আগের দিন কাঠের উপর একটি বাঁশ বা শাল কাঠ পুঁতে, বাঁশ বা শাল কাঠটির গায়ে কাপড় জড়িয়ে, তার উপর কাগজের ছাতা যুক্ত করে ইঁদতলা তৈরি করা হয়। এই ইঁদ পুজোর সঙ্গে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের পুজোকে সম্পূর্ণ এক করা যায় না। কারণ রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত পুরুলিয়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশের অনার্য বা উপজাতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজারা তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের বা সার্বভৌমত্বের দাবিকে স্বীকৃতি দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বা ইঁদ পুজো পালন করতেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভালো ফসলের আশায় বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে সম্ভষ্ট করে রাখার বিশ্বাস।^{১০} ইঁদপুজোর পর ইঁদতলা থেকে মাটি সংগ্রহ করে কুমারী মেয়েরা তার সঙ্গে ইঁদুরের গর্ত থেকে তোলা মাটি, বালি প্রভৃতি মিশিয়ে মাটির

পাত্র বা সরাকে ভরাট করে। সরার মধ্যে ধান, ছোলা, মুগ, যব প্রভৃতি শস্যের বীজ পুঁতে জল ছিটিয়ে সেটি কচু পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। এইভাবে মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে মাটির সরাতে ‘শষ’ পাতেন। তিনদিন পর কচুপাতা তুলে ভিজে আতপ চাল, কলা প্রভৃতি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নবম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন এই ভাবে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সপ্তম দিনে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যখন কিছুটা বড় হয়ে হেলে পড়ে, তখন ভাঁজকে গর্ভবতী কন্যা কল্পনা করে সাধভক্ষণ করানো হয়। দশম দিনে ভাঁজো তলায়, যেখানে ভাঁজোর মাটির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে মেয়েরা নিজেদের মাটির সরাগুলি নিয়ে আসে, ভাঁজো দেবীকে ঘিরে নাচগান করার পর ভাঁজোকে বিসর্জন দেয়।

ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত রাঢ়ের অপর একটি উৎসব ভাদু, পুরো ভাদ্র মাস জুড়ে পালিত হয় সেই ব্রত, সেটিও কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রামীণ জীবনের ব্রত। তবে ভাদু ব্রতের সঙ্গে ভাঁজো উৎসবের মূল পার্থক্য হল যে, ভাদু হল ফসল কাটার পর উৎযাপিত ব্রত, আর ভাঁজো বা ভাঁজৈ হল ভালো ফলনের কামনায় অনুষ্ঠিত ব্রতানুষ্ঠান। তবে পুরুলিয়া জেলার কুর্মালী ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত জাওয়া পর্বের সঙ্গে ভাঁজোর যথেষ্ট মিল রয়েছে। জাওয়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র মাসে, হুঁদ পুজোর পরে পনের দিন ধরে। ভাঁজোর মতো সেখানেও বীজ বপন করে, সেগুলি অঙ্কুরিত হলে তাকে কেন্দ্র করে নাচ গান চলে।^{১১} জাওয়া শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবত জীবন বা জিওন (জিয়ন) শব্দ থেকে। শস্যের বীজগুলি কতটা জীবন্ত রয়েছে সেটা যাচাই করার জন্য এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল। ভাঁজো শস্য বিষয়ক লোকাচার হলেও কোথাও কোথাও বলিদানের চল রয়েছে, ঢাণ্ডাশ, ঝিঙের মতো সবজি বলি দেওয়া হয়।^{১২}

ভাঁজো গানের বিষয়বস্তু : ভাঁজো উৎসব বা ভাঁজো ব্রতের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভাঁজো গানগুলি। উৎসবের প্রথম দিনে অর্থাৎ শষ পাতার দিন ভাঁজো দেবীকে আবাহন করে যে গানগুলি গাওয়া হয়, সেখানে আসলে থাকে বিবাহিত মেয়ের নিজের বাপের বাড়িতে আসার কথা। যেমন একটি গানে রয়েছে –

“ভাদ্র মাসে আসেন ভাঁজো, আসেন বাপের বাড়ি গো,
বাপের বাড়ি আসেন ভাঁজো, বড়ই সে আদুরি গো
এসো ভাঁজো, বোসো ভাঁজো, এই পিঁড়িতে বোসো গো
আদরে পুজিব ভাঁজো, মুখটি তুলে হেসো গো।”

আবার অন্য একটি গানে পাওয়া যায় –

“ভাঁজো লো কলকলানি, মাটি লো সর
ভাঁজোর গলায় দেবো মোরা পঞ্চফুলের মালা
এক কলসি গঙ্গাজল, এক কলসি ঘি
বৎসরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি।”

তৃতীয় দিনে নৈবেদ্য দেবার পর বপন করা বীজগুলি যাতে অঙ্কুরিত হয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠে তার প্রার্থনা জানিয়ে গান গাওয়া হয়। যেমন –

“ভাঁজো কলকল, ভাঁজো কলকল, ভাঁজো আমার মা
তবুও সোনার ভাঁজো গা তুলে না
গা তুলোরে ভাঁজো আমার, গা তুলো মা
বসতে দেব শীতল পাটি, খেতে দেব ননী
জনম সফল হোক, মা হও তুমি।”

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দিনেও মাটির সরাতে নৈবেদ্য দেবার পর একই ধরনের গান গাওয়া হয়। যেমন চতুর্থ দিনের গান –

“তিন দিনকার ভাঁজই আমার চারে দিল পা
তবুও তো সোনার ভাঁজো গা তোলে না
গা তোলরে ভাঁজো আমার, গা তোল মা
যা চাও তাই দেব, আমার লক্ষী মা

মা হওয়াটা বড় কথা, বল যাদুমানি
যাদুকে দেবো খেতে এবার ক্ষীর, সর, নুনী
বর্ধমানের সীতাভোগ, শক্তিগড়ের ল্যাংচা
মানকরের কদমা দেব, জামালপুরের মাখা
জয়নগরের মোয়া দেব, মা বল রে শুন।”

আবার সপ্তম দিনে যখন অন্ধুরিত গাছগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে যায় তখন সেগুলি একত্রে পাটের সুতো দিয়ে বাঁধা হয়।
ভাঁজোকে গর্ভবতী ভেবে নিয়ে সাধ খাওয়ানো হয়।

“সাধ খাওরে ভাঁজই, সাধ খাও
তোমার দেওয়া এই ঘরখান দানে নাও
বারো হাত কাপড়খানি, তেরো হাত ডোরসি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরো, কাঁকালে কলসি।”

অষ্টম দিন থেকেই মেয়ের পুনরায় পতিগৃহে ফিরে যাবার ভাবনায় মায়ের বুকে যেন বেদনার সুর বেজে ওঠে। যেমন –

“আজ এতক্ষণ ভাঁজো আমার বড় ঘরের আড়ে
কাল এতক্ষণ ভাঁজো আমার আকুল পাথারে।”

নবম দিনে বিদায়ের প্রাক মুহূর্তের গানগুলিতে যেমন বিষাদের সুর আরো গভীর হয়, তেমনই ভাঁজো যাতে সাবধানে
শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে পারে সেই ভাবনাও থাকে। যেমন –

“এক পোয়া চালের মাছ কিনেছি দাঁড়িয়ে তমাল তলে
এ মাছ আমার খাবে কে, ভাঁজো চলে গেলে।”

আবার কোনো গানে থাকে –

“ভাঁজো মা যেও না বিলে বিলে
শজ্জাচিলে ছোঁ মারিবে মোরল পুঁটি বলে।”

দশম দিনে ভাঁজো পূজোর পরে ভাঁজোকে বিসর্জন দেওয়ার সময় যে গানগুলি গাওয়া হয় তার মধ্যে থাকে সজল নয়নে
মেয়েকে বিদায় জানানোর দুঃখ, আবার পরের বছরের জন্য আমন্ত্রণ। যেমন –

“কদিনই বা থাকলে ভাঁজো, এবার কাঁদিয়ে যাও
আবার আসিও ভাঁজো, মুখের পানে চাও
নৌকা পাঠাব আমরা, আসবে হাসি মুখে
তোমাকে ছাড়িয়া ভাঁজো, থাকব না তো সুখে।”

অথবা একটি গানে ভাঁজো দেবীর কাছে ভাল শয্যের জন্য আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া হয়েছে –

“কবে আবার আসবে তুমি নতুন জন্ম দেবে
বছর বছর মাগো আমার এমনই সিঁটি হবে
মোদের থাকা, মোদের বাঁচা, তোমার মতি হলে
বিফল হবেই মা গো, তুমি না হলে গর্ভবতী।”^{১৩}

ভাঁজোকে বিসর্জনের পর শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ, সেই শূন্যতাকে ভোলার চেষ্টাও রয়েছে গানের মধ্যে। -

“ঘর মুছি, ঘর বাড়ি, শূন্য ঘর খানি
চলে গেছে ভাঁজো আমার নয়নের মণি
ভুলতে চাহি ভাঁজোরে আমার কাজের মাঝে
তবুও ভাঁজোর কথা ক্ষণে ক্ষণে বুকেতে বাজে।”

আবার ভাঁজো উৎসবে এক পাড়ার সঙ্গে অপর পাড়ার প্রতিযোগিতা চলে। সেটি নিয়েও ছড়া কাটা হয়, যেমন –

“ও পাড়াদের ভাঁজোগুলো গরুতে খেয়েছে
আমাদের ভাঁজোগুলো লাফিয়ে বেড়েছে
ঐ পাড়ার ভাঁজোগুলো গোরের গুগলি
আমাদের ভাঁজোগুলো সোনার মাদুলি।”^{১৪}

অথবা, -

“ঐ পাড়ার ভাঁজোগুলো ছুতো হাঁড়ির তলা
আমাদের ভাঁজো দেখতে যেন সন্দেশের দলা।”

ভাঁজো গানগুলি মূলত ভাঁজো ব্রতকেন্দ্রিক হলেও, এই গানগুলির মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কগুলির কথা, নিছক কৌতুক পূর্ণ ছড়াগুলির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের অভাব, সুখী স্বচ্ছল জীবনের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি দিকগুলির কথা চলে আসে। ভাঁজো যেহেতু দেবী রূপে নয়, ঘরের আদুরে মেয়ে হিসাবে আসেন, সেহেতু সেই মেয়ে যাতে শ্বশুরবাড়িতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে সেই প্রসঙ্গ গানগুলিতে উঠে আসে -

“আমার ভাঁজো ছোট ছেলে
মাটির ঘরে থাকবে না
কাল দিয়েছি হাজার টাকা
এখনো দালান হলো না।”

কখনও আবার ভাঁজো হয়ে ওঠে বাড়ির অবিবাহিতা মেয়ে, তার মনের মতো বিয়ে দেবার ইচ্ছার কথা পাওয়া যায় কোনো কোনো গানে। যেমন -

“কাল ভাঁজুর বিয়ে দেব,
গেঁথে দেব বেল ফুলের মালা
বেল ফুলের মালা ভাঁজো, হলুদ বরণ রং
তোর লেগে দিয়ে গেলাম মনের মতো সং।”^{১৫}

আবার কোনো কোনো গান নিছক মজার ছলে গাওয়া হলেও তার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যাবে। যেমন একটি গানের অংশ -

“বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেলাম বসতে দিলে পিঁড়ে
পিঁড়ের ভিতর খোঁচা ছিল, কাপড় গেল ছিঁড়ে
তেলের ভাঁড়ে তেল নাইকো, কপালে মারে ঘা
গোপার ছেলে হয়েছে, কাঠ বিড়ালীর ছা।”

ভাঁজো পূজো করে থাকে মূলত ছোটো বয়েসের কিশোরী মেয়েরাই, সেহেতু তাদের জীবনের প্রসঙ্গও থাকে বেশ কিছু গানে। দেবরাজ ইন্দ্র কুমারী মেয়েদের পূজো প্রত্যাশা করেন, কিন্তু সেই মেয়েদের বিয়ের জন্য তার কোনো ভাবনা নেই, এই অভিযোগ করেও গান বাঁধা হয়। এরকমই একটি গানের অংশ -

“ইন্দ্র রাজা, ইন্দ্র রাজা কিসের গরব করো
আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে দিতে লারো।”^{১৬}

ভাঁজো উৎসব একান্তভাবেই মেয়েলি উৎসব, পুরুষদের সেখানে তেমন ভূমিকা থাকে না। কেবল পূজোর দিনে ঢোল, কাঁসর বাজানোর জন্যই পুরুষদের প্রয়োজন হয়। ভাঁজো পূজোতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও সেভাবে দেখা যায় না, গ্রামীণ মেয়েরা ব্রত পালন করে নিজেদের মতো করে ভাঁজোর পূজো করে। ব্রতের দিনগুলিতে এবং পূজোর দিনে তারা ছড়ার সুরে যে গানগুলি করে থাকে সেগুলির কথা ও সুর একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। মৌখিক ভাবে, পারিবারিক পরম্পরায় এই ভাঁজো গানগুলি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যেহেতু গানগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার রীতি কোনো সময়েই ছিল না সেই কারণে গানের কথাগুলি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। এই সব গানগুলিতে সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের কোনো পরিচয়

পাওয়া যায় না। কারণ এই ভাঁজো ব্রত ও গানগুলির মূল উদ্দেশ্য গ্রামের মহিলাদের মিলিত ভাবে আনন্দ লাভ করা। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে বর্ধমান জেলার লুপ্তপ্রায় এই উৎসব ও তার সঙ্গে যুক্ত এই গানগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। কৃষি বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে এই উৎসবের একটি তাৎপর্য ধরা পড়বে। এই উৎসবে বিভিন্ন শস্যের বীজগুলি বপন করে, সেগুলি অঙ্কুরিত হলে বোঝা যায় বীজগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কতটা বজায় রয়েছে। এরফলে ভাদ্রমাসে ক্ষেতে যেসব বীজ চাষ করা হয়েছে, সেগুলির উৎপাদন সম্পর্কেও অনুমান করা। একটি ভাঁজো গানের অংশে এই সহজ সত্যটি নির্দেশ করা হয়েছে –

“ভাঁজুই চারা ভালো হলে, ফসল যে হয় ভালো
ভাঁজুই মাঝে লুকিয়ে থাকে নতুন দিনের আলো।”^{১৭}

Reference:

১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), বাংলার ব্রত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬
২. তদেব, পৃ. ৯
৩. তদেব, পৃ. ৪-৫
৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ, (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৫৪ – ১৫৫
৫. Arthur. L. Campa, (1965 A.D), ‘Folklore and History’, article on Western Folklore journal, vol- 24
৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ), ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ (তৃতীয় খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ১-১৩
৭. তদেব, পৃ. ৫০- ৫৫
৮. চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা:) (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ), ‘লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৭৪
৯. তদেব, পৃ. ১৭৪
১০. করন, সুধীর কুমার, (১৩৭১ বঙ্গাব্দ), ‘সীমান্ত বাংলার লোকযান’, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৩০
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ (তৃতীয় খন্ড), পৃ. ১২১
১২. চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা:), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১৩. বিশ্বাস, দীপক, (২০০১ খ্রিস্টাব্দ) ‘লোকশ্রুতি’ প্রবন্ধ সংকলন, ১৯ তম সংখ্যা, , পৃ. ২৪০
১৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ), ‘বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর’ (চতুর্থ খন্ড), এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৫৭৬
১৫. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, (২০০৯ খ্রিস্টাব্দ) ‘বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি : একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা’, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১৭
১৬. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ), লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৫৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৫